ট্যাক্সি ড্রাইভার, শ্রমিক ও চাকুরে

মহিউদ্দিন শানু

আবহমান কাল থেকেই বাঙ্গালি জাতি সেই ঐতিহ্যের অধিকারী, যেখানে সমাজের নানা শ্রেণীর কর্মী এমনকি নিপুণ ক্রীড়াবিদ বা শিল্পীদের অবদানকেও খাটো করে দেখার প্রবণতা রয়েছে। তাদেরকে কি নামে ডাকা হয়, তা থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। একটু পরেই সে প্রসঙ্গে আসছি। তার আগে, প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুনঃ পাশ্চাত্যের অগ্রগামী সমাজে ডাক-পিওনকে 'ডেলিভারি অফিসার' বলা হয়; গাছ-কাটা কর্মী সেখানে 'ট্রী সার্জন'; শেফারি সেথায় এক সম্মানজনক পেশা। একজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী যুবতীও সেখানে অবলীলায় তার জীবনসঙ্গী হিসেবে একজন ব্রিক লেয়ারারকে বেছে নেয়। দেশের প্রধান মন্ত্রীও একজন হেয়ারড্রেসারের সাথে ঘর বাঁধেন। গীটারিস্ট, ভায়োলিনিস্ট, পিয়ানিস্ট– ইত্যাকার শব্দগুচ্ছ বিশ্লেষণ করলে শিল্প ও শিল্পীর প্রতি পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের গভীর শ্রদ্ধাবোধের প্রমাণই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই যন্ত্রশিল্পীবৃন্দ সেখানে কেবলমাত্র গীটারবাদক, বেহালাবাদক কিংবা পিয়ানোবাদকই নন, তাঁরা সেই সমাজে 'গীটারবাদী', 'বেহালাবাদী' ও 'পিয়ানোবাদী' হিসাবেও বিবেচিত হন [গীটার+ইজম (অর্থাৎ বাদ)–>গীটার+ইস্ট (বাদী), ইত্যাদি]। ব্যাকরণগতভাবে কথাটা হাস্যকর শোনালেও ভাবগতভাবে ধারণাটার উৎপত্তি আসলে সেটাই। একটা সমাজ তো আর এমনি এমনিই উপরে উঠে যায় না, তার অনেক কারণ থাকে!

পক্ষান্তরে আমাদের দেশে যাঁরা মানুষকে দিয়ে যাচ্ছেন অক্লান্ত সেবা, সমাজকে করে তুলছেন পরিচ্ছন্ন, পরিশীলিত ও উন্নত, তাঁদেরকে কি নামে ডাকা হয়? ডোম, মেথর, মুচি, চামার ('চামার' তো এই সমাজে একটি গালি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়), ইত্যাদি। এমনকি মুচি, বাবুর্চি শব্দ দুটোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের ললিতকলা অঙ্গনের এক যন্ত্রশিল্পীকেও লোকে আখ্যা দিয়েছে 'তবলচি'। এক্ষেত্রে 'চি' শব্দের আভিধানিক অর্থ খোঁজার কোনো দরকার নেই, কারণ তা অবান্তর। কিন্তু যা অবান্তর নয় এবং যা খোলা মনে চোখ বুঁজলেই দিব্যি অনুভব করা যায়, তা হচ্ছেঃ এই শব্দগুলোর মাধ্যমে উক্ত মানুষগুলোকে অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। যেন তারা কোনো এক তথাকথিত 'বনেদি' (অবশ্যই সামন্তবাদী) শ্রেণীর উচ্ছিষ্ট ভোগ করে টিকে রয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রাচীন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অমানবিক প্রথার জের ধরেই এই শব্দগুলোর উদ্ভব হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে নীরবে এক ধরণের কুৎসিত মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। এই প্রবণতা এত সুদূরপ্রসারী যে, এত কাল পরে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 'দড়াবাজ' শব্দটি তেমন আপত্তিকর নয় বটে, তবে তা তেমন রুচিকরও নয়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানমতে এই শব্দটি ইংরেজি 'অ্যাক্রোব্যাট'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। যেন 'রংবাজ' বা 'চাপাবাজ' এই শব্দগুলোর সঙ্গে 'দড়াবাজ' শব্দের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই ধরণের আরও হাজারো উদাহরণ রয়েছে। যেমন, আজও আমাদের বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মানুষ 'ডাক্তার সোবহান' না বলে 'সোবহান ডাক্তার' বলতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এই স্বাচ্ছন্দ্যবোধের কারণ সেই 'কুৎসিত মানসিকতা', যা থেকে এই সমাজের সবচেয়ে সংস্কারমুক্ত ও বিনয়ী মানুষগুলোও পুরোপুরিভাবে মুক্ত নন। চেহারাগত, গাত্রবর্ণগত, পদগত, শ্রেণীগত কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে অন্যকে হেয় করে দেখা তো বাঙ্গালির একটা চিরকালের বাতিক ও মজ্জাগত স্বভাব। এক্ষেত্রে অধিকাংশ বাঙ্গালিই সমানভাবে পারদর্শী– সে শিক্ষিত, মূর্খ, স্বদেশী বা পরবাসী, যে-ই হোক না কেন।

কথায় বলে, ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তাই তৃতীয় বিশ্বের মানুষ যখন পাশ্চাত্যের সভ্য দেশে বসবাস করতে যায়, তখন সাথে করে নিয়ে যায় তার এতকালের

সেই ছুঁচোটে মনোবৃত্তি। এক্ষেত্রে বাঙ্গালি তথা বাংলাদেশীরা সবচেয়ে অগ্রগামী। দেশে যেমন কে কতো বড় আকারের পশু কোরবানী দিতে পারে, তাই নিয়ে হয় অসুস্থ প্রতিযোগিতা– প্রবাসের মাটিতেও তেমনি কে কতো বিশাল বাড়ী কিনতে (আসলে তার সিংহভাগ তো ব্যাঙ্কের টাকায়) পারে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। সেখানে হজ্ব করা, নিত্য নতুন সংগঠন খোলা, সন্তানের স্কুলের গ্রেড, নিজের পেশা– এই সব বিষয়কে সম্বল করে অভিবাসী বাঙ্গালিরা মহা সমারোহে চালাতে থাকে এক বরাহীয় কালচার। হজ্ব করা, সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করা, উন্নত কর্ম-সংস্থানের প্রয়াস– এ সব অবশ্যই মানুষের কর্তব্য বিষয়ের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা তখনই বরাহবৎ পর্যায়ে চলে যায়, যখন বাঙ্গালি এই বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে অন্যের প্রতি নাক সিঁটকাতে থাকে। এই নাক সিঁটকানি আজ প্রবাসের বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের বিরাট এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'তোমার বৌ সুন্দরী তো কি হয়েছে, তুমি নিজে তো টেকো! এই দ্যাখো, আমার মাথাভর্তি কত্তো চুল!' 'তোমার মাথাভর্তি চুল তো বয়েই গেল, তুমি তো চল্লিশ পেরোলে! আমি কত্তো জোয়ান তাগড়া!' 'তুই জোয়ান তাগড়া তো আমার তাতে কি আসে যায়? তোর তো দোতলা বিরাট বাসা নেই! চেয়ে দ্যাখ, আমি কি বিশাল বাসায় থাকি!' 'তুই বিশাল বাসার মালিক হলে আর কি হবে! তোর বাপ-দাদা ছিল তো সব্জী ফেরিওয়ালা ছোটলোক। জানিস্, আমার চৌদ্দ পুরুষের শরীরে জমিদারি রক্ত বইছে!'– এই হচ্ছে উপরোক্ত বরাহীয় কালচারের কিছু নোংরা মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি সবসময় খালি চোখে হয়তো পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিনিয়ত তা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। প্রবাসে বসবাসকারী বিজ্ঞজনমাত্রই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

যাই হোক, ধান ভানতে শিবের গান না গেয়ে এবার বরং সরাসরি আসল কথায় চলে যাই। বেশ কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অভিবাসী হওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। সৌভাগ্য এই কারণে যে, এত সুন্দর একটা দেশের সুন্দর মানুষদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম। অনেক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, যা একজন সামান্য সাংবাদিক হিসাবে আমার সারা জীবনের অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে। আর দুর্ভাগ্য এই কারণে যে, আমি কিছুটা প্রাচীনপন্থী। ঐ উন্নত সমাজের সাথে পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ার যোগ্যতা বা মানসিকতা আমার ছিল না। আজ আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি যে, এ ছিল সম্পূর্ণভাবে আমার নিজেরই ব্যর্থতা। আজ পাঁচ বছর হতে চললো আমার দেশে ফেরা। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব পেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন সেখানে টেকেনি। বাংলাদেশে ফিরতেই আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সেই একঘেঁয়ে প্রশ্নে জর্জরিত হতে হলো, 'কি রে শানু, সবাই বিদেশে যাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে থাকে। আর তুই কিনা বাড়া ভাতের থালা পায়ে ঠেলে দিয়ে চলে এলি?' আমি তাদের কি বোঝাবো? ওদের দোষ দেই না। সব তো আর তারা জানে না। আর তা ছাড়া অবস্থাপন্ন পিতামাতার একমাত্র সন্তান হলে মানুষ বোধ হয় কিছুটা বখেই যায়। শিশুকাল থেকেই আমি একরোখা, খামখেয়ালি ও ছন্নছাড়া গোছের। সুন্দর করে বলতে গেলে বলতে হয় 'স্বাধীনচেতা'। তাই দেশে চলে এলাম। বাবার প্রেসের পুরাতন ব্যবসা দেখাশোনার কাজে আবার নূতন করে হাত দিলাম। সেই সঙ্গে আগের সেই 'সখের সাংবাদিকতা'। যদিও তা গালভরা বুলি। আসল কথা, দেশে থাকার যে আলাদা মজা, যে গুষ্টিসুখ, তা থেকে বাকী জীবন বঞ্চিত হতে মন চায়নি। ক'দিনেরই বা জীবন আমাদের!

তবু অস্ট্রেলিয়ার প্রবাস জীবনের সব কথা মনে আছে। সারা জীবন মনে থাকবে। পাক্কা সাড়ে চার বছর কেটেছে সেখানে। প্রবাদ রয়েছে, 'স্বদেশের ঠাকুর ভিন দেশে গিয়ে হয়ে যায় কুকুর!' আর ঠাকুরের এই কুকুরে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী থাকে, তারা হলো ভিনদেশে বসবাসকারী ঠাকুরেরই স্বজাতীয়রা। তবু এক ধরণের মনের টানেই এখনো মাঝে মধ্যে ওখানকার বাঙ্গালি সমাজের হালচাল দেখি। আজকাল

ওয়েব সাইটের বদৌলতে কাজটা আরও সোজা হয়ে পড়েছে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া থেকে বেশ কিছু বাংলা ওয়েব সাইট পত্রিকা বেরুচ্ছে। আমাদের সময়ে এগুলোর তেমন রমরমা অবস্থা ছিলো না। যাই হোক, এগুলোর মধ্যে কর্ণফুলি ওয়েব ম্যাগাজিনটির হোমপেজ সাদামাটা হলেও মাঝে মাঝে বেশ ব্যতিক্রমধর্মী লেখা এখানে প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ এর প্রধান সম্পাদক বনি আমিন সাহেবের লেখার হাত খুবই ভালো। অনেক অজানা তথ্যই তাঁর ক্ষুরধার লেখনি থেকে বের হয়ে আসে। বাংলাদেশী তথা বাঙ্গালিদের প্রচুর নষ্টামি, ইতরামি ও নোংরামির কাহিনী তিনি তুলে ধরেন, যার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কিন্তু মাঝে সাঝে কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন, যা তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত (যদ্দূর শুনেছি) একজন মানুষের পক্ষে বেমানান। যেমন, প্রায়ই তিনি তাঁর লেখাতে ওখানকার ট্যাক্সি চালকদের 'পরিবহন শ্রমিক' হিসাবে উল্লেখ করেন। ধারণা করা যায় যে, সম্পাদক সাহেবের এক বা একাধিক ঘোর শত্রু ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাই বলে তাঁর কি উচিৎ হয় এই ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে নিজস্ব ওয়েব সাইটে সারা ট্যাক্সি চালক সম্প্রদায়ের প্রতি বিষোদগার করা, হোক না তা যতোই সুকৌশলে? এটা কি আন্তর্জালিক মালিকানার অপব্যবহার নয়? ট্যাক্সি চালকদের শুধু 'পরিবহণ শ্রমিক' আখ্যা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, বারংবারই ঐ পেশার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ঘৃণা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন।

এটা সত্যিই দুঃখজনক। প্রথমতঃ একজন দায়িত্বশীল পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে ভাষায় তাঁর আরো পরিচ্ছন্ন ও নিরপেক্ষ হওয়া উচিৎ। কারণ উক্ত নামকরণটির মধ্যে দিয়ে একটা বিশেষ পেশার লোকজনের প্রতি তাঁর নাক সিঁটকানি মনোভাব প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ 'শ্রমিক' শব্দের সত্যিকার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্যের কোনো দেশের ট্যাক্সির মালিক বা চালক– কেউই আসলে শ্রমিক নন। ট্যাক্সির মালিক তো ননই, চালকও শ্রমিক নন– তিনি গাড়ীর মালিকের কাছ থেকে শুধুমাত্র গাড়ীটি ভাড়া নিয়ে থাকেন। তাঁদের পেশার সঠিক শ্রেণীবিভাগিকরণ যদি করতেই হয়, তবে সেক্ষেত্রে 'সেল্‌ফ্‌ এমপ্লয়মেন্ট' বা 'স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থান' শব্দমালাই হবে জুৎসই। এটা এক প্রকারের ক্ষুদ্র ব্যবসা, যেখানে আর দশটা ব্যবসা পদ্ধতির মতো মুনাফাই ব্যবসায়ীর উপার্জন হিসাবে বিবেচিত হয়। শ্রমিকরা যেমন মজুরী পেয়ে থাকেন, তেমন কোনো মজুরী 'ট্যাক্সি চালক' নামের এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কারো কাছ থেকে পান না। তৃতীয়তঃ শ্রমিক শ্রেণী এই পৃথিবীর বিরাট এক সম্পদ। তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন ভাবেই খোঁটা দেওয়া বা তাদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করাটা ঠিক নয়।

আমি নিজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছি। আজ আমি পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করতে চাই যে, উক্ত পেশাতে অন্যান্য প্রবাসী ছাড়াও প্রচুর বাংলাদেশীর জড়িয়ে পড়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণভাবে একটা ধারণা চালু রয়েছে যে, অভিবাসীদের পেশাগত যোগ্যতা ও উচ্চশিক্ষার অভাবের কারণেই তারা এই পেশাটি বেছে নেয়। রিফিউজিভুক্ত কিছু স্বল্পশিক্ষিত প্রবাসীর জন্য কথাটা সত্যি হতে পারে। কিন্তু এই ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই– এটা এই পেশা-বহির্ভূত কিছু উন্নাসিক অভিবাসীর রুচিহীন ব্যাপক রটনার ফলশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে ট্যাক্সি চালনার কাজ হাড়ভাঙ্গা ফ্যাক্টরীর কাজ (যে কাজ অসংখ্য অভিবাসী করে থাকেন) অপেক্ষা অনেক সহজতর। প্রবাসজীবনে আমি অনেক বাঙ্গালি ও ভিন্নভাষী ট্যাক্সি চালককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, যাঁরা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ, মেধায় অনন্য, রুচি ও শিল্পজ্ঞানে অসাধারণ। অনেক ঠুলিপরা অফিস কর্মচারীই সেক্ষেত্রে তাঁদের কাছে নস্যিতুল্য।

আসলে যে সকল কারণে মানুষ ট্যাক্সি চালনার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, ট্যাক্সি চালনা একটি স্বাধীন পেশা। এই পেশার মানুষদের নেই কোনো উর্ধ্বতন

কর্মকর্তা, সুতরাং তাদের নেই কোনো বসের নিকট জবাবদিহিতা। তা ছাড়া প্রতি মুহূর্তে চাকুরী হারানোর দুশ্চিন্তায় তাকে দিনাতিপাত করতে হয় না। উন্নত দেশগুলোতে যে কোনো কাজেই ভয়ানক চাপ, সেখানে ফাঁকিবাজির তিলমাত্র অবকাশ নেই। তুলনামূলকভাবে ট্যাক্সি চালনা পেশা হিসাবে অনেক সহজতর। নিন্দা করাই যাদের কাজ, এই ধরণের কিছু মানুষ ট্যাক্সি ব্যবসায়ে ব্যাপক ট্যাক্স কারচুপির অভিযোগ তোলেন। এটা নিছক বিদ্বেষপ্রসূত। কারণ ঐ সকল উন্নত দেশে প্রত্যেক মানুষের আয়-ব্যয়ের একটা আন্দাজপূর্ণ হিসাব দেশের সরকার তথা কর বিভাগ সহজেই করতে সক্ষম এবং সেটা তাঁরা নিয়মিতভাবে করেও থাকেন। কে কতো উপার্জন না করলেই নয় (অর্থাৎ নচেৎ তার সংসার চলবে না), এই সকল উপাত্তভিত্তিক আধুনিক সমাজে কর্তৃপক্ষ তা সহজেই নির্ণয় করতে পারেন। তাই এ রকম একটা সিস্টেমের মধ্যে বাস করে কারো পক্ষে ব্যাপকভাবে কর ফাঁকি দেওয়া কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। এখানে একটা কথা না বললেই নয়। আমার এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য মোটেও ট্যাক্সি ড্রাইভিংকে এক মহান পেশা হিসাবে তুলে ধরা নয়, স্রেফ কিছু মানুষের কিছু ভুল ধারণা যাতে দূর হয়, সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

হ্যাঁ, এমনটা হতেই পারে যে, ট্যাক্সি চালকদের অনেকেই মানুষ হিসাবে তেমন ভালো নন, সুশীল নন। কিন্তু তাঁরা ট্যাক্সি চালান বলেই তাঁদের স্বভাব ও রকম, তা তো নয়। এক্ষেত্রে তাঁদের পেশার সঙ্গে স্বভাবের যোগসাজশ তৈরী করার চেষ্টা অন্যায়। এটা এক ধরণের সাম্প্রদায়িকতা, যা আজকের বিশ্বে কাম্য নয়। ভালো-মন্দ সুশীল-কুশীল সব পেশার মানুষের মধ্যেই রয়েছে, সব জাতিতেই রয়েছে, সব দেশেই রয়েছে।

আদি মনুষ্য সমাজে আদিম সাম্যবাদ কায়েম ছিল। তাদের না ছিলো কোনো বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা, না ছিলো তাদের মাঝে সবকিছু করায়ত্ত করার প্রবণতা। ক্রমান্বয়ে সে সব এলো। সেই সাথে এলো দাসত্বপ্রথা। এলো অন্যকে ‘গোলাম’ বা ‘চাকর’ বানিয়ে রেখে মানুষ শোষণের প্রথা– ক্রীতদাস প্রথা। শিল্প-বিপ্লবের ফলে সেই সব সামন্তবাদীপ্রথা ভয়ানকভাবে ঝাঁকানি খেলো। তাতে কী! পালটে গেল অন্য মানুষকে চাকর বানিয়ে রাখার কৌশল। নব্য মালিক শোষণের পদ্ধতি বদলিয়ে ফেললো। সে তার ‘ব্যবসা’-র আধুনিকায়ন করলো। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান তৈরী করলো, অফিস বানালো। এখানেও তার নতুন চাকর-বাকর দরকার– অনেক অনেক চাকর। তবে নিজের স্বার্থেই এবারে তার প্রয়োজন কোট-টাই-পরা শিক্ষিত চাকরের। তাই সে নিয়োগ করে চললো শিক্ষিত চাকর। ধূর্ত শোষক মালিক ‘চাকর’ নামটা একটু বদলিয়ে তাকে করলো ‘চাকুরে’। নব্য আদলের একটা ভালো দিকঃ এই চাকুরেরা ক্রীতদাস নয়। তাদেরকে মালিকের যদি আর দরকার না হয়, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মারহাবা! এ না হলে আবার কিসের বিপ্লব!

সবাই খেয়েপরে বেঁচে থাকুক। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাকুরে সবাই টিকে থাকুক। মানবতার সত্যিকারের মুক্তি আসুক। বাঙ্গালি তথা সমগ্র মানবজাতি চিন্তায়-ভাবনায় আরও উন্নত হোক।

ঢাকা, ১১/১১/১১

ইমেইল # mohiuddinshanu@gmail.com